

আমাদের জাতীয় সংগীত ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর চেতনা

- শাহাদত হোসেন (দুবাই)

অবাক হচ্ছিলাম বিটিভি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত এর বদলে "প্রথম বাংলাদেশ আমার জীবন বাংলাদেশ" শুনে। একটি দেশের কর্নধার কতটুকু সঙ্কীর্ণ মনো হলে জাতীয় সংগীতকে অবহেলা বা ঘৃণা করতে পারে; এর প্রতিস্থাপন করতে পারে নিজের দলীয় পদ্যকে। এই মানসিকতার পেছনে কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবজ্ঞা আর এই অবজ্ঞার কারণ তিনি হিন্দু এবং ভারতীয় বাঙালী। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগীত গুলোর অন্যতম। এতে নেই কোন উগ্রদেশপ্রেম নেই কোন সাম্প্রদায়িক শব্দ; এর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে ছড়ানো প্রকৃতি প্রেম। পৃথিবীর আর কোন জাতীয় সংগীত এতো কাব্যমন্ডিত কিনা আমি জানিনা। যখন কাউকে গাইতে শুনি: **চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি**" সাথে সাথে এ প্রবাসে বসেও বাঙলার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আকাশ, ঘাস ফুল ফসল শিশির কচুরি পানা চৈত্রের অলস মধ্যাহ্নের রাগ মিশ্রিত বাতাস ব্যাকুলতার সুরে বেজে ওঠে আমার হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে। আমি সুস্থভাবে বুকভরপুর নিশ্বাস নিতে পারি। আমার রক্তের প্রতিটি কণা বিশুদ্ধ অক্সিজেনে সজীব হতে থাকে। যখন শুনি **'মা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে জানে পাগল করে, মরি হায় হায় রে ওমা'** তখন আমার কল্পনা আমাকে নিয়ে যায় জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় শৈশবে; আমি দেখতে পাই খালি পায়ে উদ্যম গতরে হাফপ্যান্ট পড়ে আমি আমগাছের বনে বনে ব্যগ্র হয়ে সাথীদের সাথে আম কুড়াতে ব্যাপ্রত রয়েছি। যখন শুনি **ওমা সন্ধ্যা হলে দিন ফুরালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে/ তখন খেলা ধুলা সকল ছেড়ে তোমার কোলে ফিরে আসি** তখন আমি পল্লীর ওপর নেমে আসা বিজলি বাতিপূর্ব বিশুদ্ধ সন্ধ্যার ঘ্রান পাই, চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার সুখপ্রদায়ী বাল্যকাল যখন আমি শিশিরের শব্দের মতো নেমে আসা সন্ধ্যার বাঁশির সংকেতে আমার সব খেলার সাথীদের ছেড়ে ছুটে চলে এসেছিলাম আমার মায়ের ঘুমপাড়ানীয়া স্নেহের কোলে; আমার সমস্তকোষগুলো সজীব হয়ে ওঠতে থাকে, আমি সুখ রোমন্থন করতে থাকি, আমি তখন কিছুসময়ের জন্যে শ্রেষ্ঠ জীবন যাপন করতে থাকি। এমনি তীব্রসংবেদন জাগানীয়া আমাদের এই মহিমামন্ডিত জাতীয় সংগীত।

বস্তুতঃ যে পরিমান জ্ঞান আর মানবিক সংবেদন ধারণ করলে একজন লোক কাব্যমন্ডিত এই জাতীয় সংগীতকে উপভোগ করতে সক্ষম হয় তা শোচনীয়রূপে শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে অনুপস্থিত; বিপরীতদিকে তাদের অস্থিমজ্জায় মেশে আছে পাকিস্তানী ভাবধারা যদিও তাদের কেউ কেউ পরিস্থিতির কারণে মুক্তিযুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলো ১৯৭১ এ। তাদের অনেকেই যদিও বাংলা ভাষা সাহিত্যের কথা বলে, বিভিন্ন সাহিত্যসভায় প্রধান

অতিথি হয়, দেশীয় সংস্কৃতির বাঁধাবুলি আওড়ায় কিন্তু আসলে যে তারা শুদ্র মুসলমান, সাম্প্রদায়িকতার চেতনা যে তাদের মগজে আজন্ম লালিত পুষিত বিকশিত হয়ে চলছে, তারা কি করে পারবে অসাম্প্রদায়িক হয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে শিল্প সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে, এর স্বাদ উপভোগ করতে।

কী অবদান আছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে শুদ্র বাঙলাদেশী মুসলমানদের? বাঙলা সাহিত্যের যা কিছু উৎকৃষ্ট তার সবইতো হিন্দু বাঙালীদের অবদান। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন বিদ্যাসাগর পানিনি বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসুয়ারা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণ পুরুষ তাঁরা সবাইতো হিন্দু। তাঁদের বাদ দিলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আর যা বাকি থাকে তা অনেকাংশেই অপসাহিত্য। এতো ঘৃণাই যখন ওদের প্রতি তাহলে বললেইতো হয় আমরা বাংলা ভাষা-টাসা চাই না সাহিত্য বুঝি না, ওসব হিন্দুদের কর্ম, ওসবের মধ্যে আমরা শুদ্র মুসলমান নেই। একদিকে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠার ভান করা আর অপরদিকে মনে মনে এর প্রধান পুরুষদের ঘৃণা করা বড়ই বাড়াবাড়ি রকমের হটকারীতা। এসব যতো শীঘ্রবন্ধ হয় ততই মানবতার জন্যে কল্যাণকর।

হাস্যকর হচ্ছে যে বাঙলা নববর্ষ উৎযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত হোটেল শেরাটনে এক সভায় বাধ্য হয়ে তাকে অমর বৈশাখী গান **এসো হে বৈশাখ এসো** শুনতে। যখন ছেলেমেয়েরা এ গানের তালে নাচ ছিল আমার মনে হয়েছে তারা যেনো প্রধানমন্ত্রী ও তার পারিষদমণ্ডলীকে ব্যংগ করে বলছে আজ তোমাদেরকে **কবিরের** গান শুনতেই হবে, তোমাদের বৈশাখ উৎযাপনে যে গিটীকার দরকার তার জন্যে রবীঠাকুরের কাছে ভিক্ষা করা ছাড়া গতন্ত্যর নেই। কবিগুরুকে মেনে নাও নয়তো বৈশাখ উৎযাপন ছেড়ে দাও। চলতি বাংলায় যাকে বলেঃ **'হাইয়ের লাইগ্যাও কান্দে শুটকি মাছ ও রাঞ্জে'** ব্যাপারটিকে বাঙালী আবহমানকাল থেকেই ঘৃণা করে আসছে।

মূলত বাংলা ভাষা, বাঙালী ও তার সংস্কৃতি আর রবীন্দ্রনাথ আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। এর একটিকে ঘৃণা করে অপরটির জন্যে দরদ হাস্যকর। একাকার হয়ে মিশে আছেন রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর ষড়ঋতু, আকাশ-বাতাস, প্রেমিক-প্রেমিকার দীর্ঘশ্বাস, পাখি-ঘাস আর যা কিছু প্রাকৃতিক সব কিছুতে। তাঁকে বাদ দিয়ে পাক-বাঙলাস্থানী উৎসব করা যেতে পারে কিন্তু বাংলা নববর্ষ নয়।

আমার শেষ আহ্বান হয়তো পাক সার বাদ গেয়ে পাকিস্থানী অপসাংস্কিত অনুষ্ঠান আপনাদের দলীয় অফিসে পালন করুন, না হয় গো-আজমকে দিয়ে পাকভাবমিশ্রিত অন্যরকম রজব, শাওয়াল বা কদরের গান লিখিয়ে আরবি ফার্সি সাহার (মাস এর আরবি শব্দ) উৎযাপ করুন। আর তাকে বানিয়ে নেন আপনাদের দলীয় বর্ষবরণ গান। কিন্তু দয়া করে বৈশাখে হাত দেবেনা। এটা বাঙালীর খাঁটি নিজস্ব গান।